যুগান্তর

তারিখ 22 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনিয়ম-দুর্নীতি রুখবে কে?

ড. কুদরাত-ই-খুদা বাবু

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, দেশে বর্তমানে ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৯৫টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নিয়ন্ত্রক সংস্থা হচ্ছে ইউজিসি। সংস্থাটি সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগসূত্র রেখে এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতি রোধে ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে যে করিতকর্মা গতিতে ভূমিকা রাখতে তথা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে, হুশিয়ারি উচ্চারণপূর্বক বক্তব্য দিতে, সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে দেখা যায়, ঠিক সেভাবে কিন্তু দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনিয়ম-দুর্নীতি রোধে ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় না। অথচ পাবলিক কিংবা প্রাইভেট, সেটা যে ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়-ই হোক না কেন, ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতি রোধে ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একই ধরনের ভূমিকা পালন করা উচিত। যদিও দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হওয়ার জন্য নিজস্ব আইন-কানুন আছে, তবে তা অবশ্যই রাষ্ট্রীয় আইন ও জনস্বার্থের ঊর্ধ্বে নয়। কারণ এসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয় জনগণের কষ্টার্জিত টাকায়। যদিও মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনিয়ম আর দুর্নীতির কারণে দেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান আজ নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ, তাই বলে দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মান এবং শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া ইত্যাদি যে কোনোভাবেই প্রশ্নবিদ্ধ নয়, সে কথা বলা যাবে না। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, ১৮ ডিসেম্বর প্রকাশিত দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদনের মাধ্যমে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রভাষক নিয়োগে পদে পদে অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরেছে। টিআইবি কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব অনিয়মের চিত্র তুলে ধরে বলা হয়, ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে দেখা গেছে, আটটি বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রভাষক নিয়োগে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে। এ পদে নিয়োগে ৩ লাখ থেকে সর্বোচ্চ ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত লেনদেন হয়েছে। 'সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগ : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক ওই গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, নিয়োগের আগে থেকেই বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম শুরু হয়। নিয়োগ বোর্ড গঠন, সুবিধামতো যোগ্যতা পরিবর্তন বা শিথিল করা, জবাবদিহি না থাকার মাধ্যমে এই অনিয়মের শুরুটা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ বোর্ড গঠনে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শের সুযোগ বিদ্যমান ছিল।

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিদ্যাপীঠখ্যাত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরা যাক। ২০১২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় অনেক মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে (এমনকি পিএইচডি ডিগ্রিধারী এবং অনার্স ও মাস্টার্সে সারা দেশে সবচেয়ে ভালো ফল করার জন্য প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গোল্ড মেডেল পাওয়া প্রার্থী) বাদ দিয়ে আইন ও বিচার বিভাগে তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এমন একজন প্রার্থীকে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ দেয়, যার অনার্সে প্রথম শ্রেণী বা সমমানের জিপিএ ছিল না।

নিয়োগের আগেই আরও যেভাবে অনিয়ম শুরু হয়, তারও কিছু চিত্র তুলে ধরা হয় ওই প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনে বলা হয়, কোনো কোনো শিক্ষক পছন্দের শিক্ষার্থীদের একাডেমিক পরীক্ষার ফল প্রভাবিত করেন এবং পরবর্তী সময়ে তাদের নিয়োগ দেয়া হয়। এ ছাড়া বাজার করাসহ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করে আগে থেকেই একাডেমিক পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়। ক্ষেত্রবিশেষে নারী শিক্ষার্থীর একাংশের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে একাডেমিক পরীক্ষায় নম্বর বাড়িয়ে দেয়া, পরীক্ষার আগে প্রশ্ন জানানো ও পরবর্তী সময়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এসব অনিয়মের কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় 'নোট অব ডিসেন্ট' বা আপত্তি জানানো-এর সুযোগ থাকলেও সেটিকে গুরুত্ব না দিয়ে সিন্ডিকেট নিয়োগ চূড়ান্ত করে। ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১২টিতেই কোনো না কোনো নিয়োগের ক্ষেত্রে 'নোট অব ডিসেন্ট'কে কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে দেখা যায়নি। এ ছাড়া ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মবহির্ভূতভাবে বিজ্ঞপ্তির চেয়েও বেশি শিক্ষক নিয়োগ করা হয় এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ ও দল ভারি করা এসব অনিয়মের একটি বড় প্রভাবক।

প্রশ্ন হচ্ছে, টিআইবির এ গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্যসমূহ শতভাগ সত্য না হলেও তা যে পুরোপুরি মিথ্যা কিংবা সঠিক নয়, তা কিন্তু দেশের বাস্তব প্রেক্ষাপটে কোনোভাবেই বলা যাবে না এবং বলার কোনো উপায়ও নেই। আর এ গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্যসমূহ যদি একভাগও সঠিক হয়, তবে তা দেশের উচ্চশিক্ষার জগতে অবশ্যই হতাশাব্যঞ্জক এবং উদ্বেগজনক ঘটনাই বটে। কারণ মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের উপেক্ষা করে দলীয় বিবেচনায় এবং টাকার বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত কম মেধার একজন শিক্ষক নিয়োগ হলে ওই শিক্ষক প্রায় ৪০ বছর ওই বিশ্ববিদ্যালয়কে উত্তম শিক্ষা দেয়া থেকে বঞ্চিত করবেন— যা জাতির জন্য সুখবর নয়। বাস্তব অবস্থা এই যে, দেশের অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে জ্ঞান-গবেষণা চর্চা কেন্দ্রের পরিবর্তে দলীয় লোকদের কর্মসংস্থান ব্যুরোতে পরিণত হয়েছে।

অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও গবেষণার মান বাড়ানোর কোনো উদ্যোগ না থাকলেও কিংবা কোনো নিয়ম তৈরি করা না হলেও এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়াটা ঠিকই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদাহরণ হিসেবে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিদ্যাপীঠখ্যাত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরা যাক। ২০১২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় অনেক মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে (এমনকি পিএইচডি ডিগ্রিধারী এবং অনার্স ও মাস্টার্সে সারা দেশে সবচেয়ে ভালো ফল করার জন্য প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গোল্ড মেডেল পাওয়া প্রার্থী) বাদ দিয়ে আইন ও বিচার বিভাগে তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এমন একজন প্রার্থীকে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ দেয়, যার অনার্সে প্রথম শ্রেণী বা সমমানের জিপিএ ছিল না। শুধু তা-ই নয়, প্রভাষক পদে আবেদন করার সময় ওই প্রার্থীর মাস্টার্স পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হওয়া দূরের কথা, তার মাস্টার্সের পরীক্ষাই তখন শেষ হয়নি। অথচ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট, ১৯৭৩-এ শিক্ষক নিয়োগ, যোগ্যতা ও বিধির এল ধারার (ক), (খ) ও (গ) উপধারায় স্পষ্টভাবে বলা আছে, 'কোনো প্রার্থীর মূল সার্টিফিকেট ও পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ব্যতীত শিক্ষক পদে কোনো আবেদন করা যাবে না।' এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে, যেহেতু শিক্ষক নিয়োগের যোগ্যতা হিসেবে অনার্স বা মাস্টার্সের যে কোনো একটিতে প্রথম শ্রেণী বা সমমানের জিপিএ থাকা আবশ্যক এবং যেহেতু ওই প্রার্থীর অনার্সে প্রথম শ্রেণী বা সমমানের জিপিএ ছিল না, তাহলে তিনি শিক্ষক পদে আবেদন করার সময় অর্থাৎ তার মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই কীভাবে বুঝলেন যে তিনি মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণী বা সমমানের জিপিএ পাবেন? সুতরাং এ ক্ষেত্রে যে বড় ধরনের অনিয়ম এবং দুর্নীতি হয়েছে এবং সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্টকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। আবার ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসনের ঠিক পূর্ববর্তী প্রশাসন বিগত চার বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ২০০ পদের বিপরীতে শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রায় ৩৫০ জন শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে (অনেক বিভাগেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে)। এ ধরনের চিত্র যে শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকালেই খুঁজে পাওয়া যাবে তা নয়, বরং দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকালেও খুঁজে পাওয়া যাবে। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, এসব অতিরিক্ত শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ফলে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে ঘাটতি হয় না? নিশ্চয় হয়। আর এ কারণেই বর্তমানে অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বাজেট ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ইতিপূর্বে একাধিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ চিত্রও দেখা গেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষকদের বেতন-ভাতা, পরীক্ষার খাতা দেখাসহ অন্যান্য বিল ঠিকমতো পরিশোধ করতে পারছে না, সেখানে এ ধরনের অতিরিক্ত শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত তা কি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, ইউজিসি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সরকারের গুরুত্বসহকারে ভেবে দেখা উচিত নয়? বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ-বাণিজ্য করে কোনো কোনো ব্যক্তি বা বিশেষ মহল ব্যক্তিগতভাবে 'কোন বনেগা ক্রোড়পতি'র মতো অবস্থায় পৌঁছে গেলেও এ ধরনের নিয়োগ যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দিনে দিনে মেধাশূন্য ও পঙ্গু করে দিচ্ছে সে কথা সহজেই অনুমেয়।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্ধারিত নীতিমালা প্রস্তুত করা এবং তার বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। যেমন- কুষ্টিয়াস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গত ১৪ অক্টোবর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩২তম সিন্ডিকেট সভায় নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নতুন প্রক্রিয়ায় লিখিত, মৌখিক পরীক্ষাসহ মোট তিনটি ধাপের মাধ্যমে শিক্ষক পদে নিয়োগ দেয়া হবে। তাছাড়া কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। এ সিদ্ধান্ত সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে বাস্তবায়িত হলে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আসার পাশাপাশি যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থীরা ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাবেন বলে আশা করা যায়। সর্বোপরি, দেশ-জাতি ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বৃহত্তর স্বার্থেই ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগসহ উত্থাপিত অভিযোগগুলোর ব্যাপারে সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। দোষী ব্যক্তিরা যেন রাজনৈতিক পরিচয়ে কিংবা অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে কোনোভাবেই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে না থাকতে পারে। বলা হয়ে থাকে, মাছের পচন ধরে মাথা থেকে আর পচন ধরলে সেই মাছকে সহজে বাঁচানো সম্ভব হয় না। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেই পর্যায়ে পৌঁছার আগেই সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত হবে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনিয়ম-দুর্নীতির পথ যে কোনো মূল্যে বন্ধ করা।

ড. কুদরাত-ই-খুদা বাবু : *সহযোগী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি; অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সদস্য*
kekbabu@yahoo.com